পিরবাবা সৈয়দ মাখদুম সাহেবের মাজার

সুব্রত ঘোষ

"অত রাত। তখন শেষ বাসও চলে গেছে। ওরা একটা ছোট হাতিতে চেপে কোন রকমে বোলপুর থেকে সিয়ান বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত আসে। রাত তখন একটা। রাস্তা কাছে হবে বলে মাঠ বরাবর হাঁটছিল ওরা। স্বামীটা এগুতে আসছিল। বউটা দুটো ছেলেকে নিয়ে ছিল পেছনে। এই সামনের মাঠে এসেছে। দেখে কি আগুতে একটা বড় বাঘ দাঁড়িয়ে। পুরুষটা তখন দিয়েছে দৌড়। মা কি আর ছেলেদুটোকে ছেড়ে যেতে পারে। মা খুব ডাকছে তখন বাবাকে। হে বাবা, তোমার সামনে বাঘের হাতে মরব। তুমি আমার ছেলে দুটোকে বাঁচাও বাবা। বাঘটা তখন বসেছে মাটোর সামনে হামাগুড়ি দিয়ে। বউটো খুব ডাকতেছে বাবারে। তো বাঘটা কি করে, সে আসছিল বাবাকে সালাম করতে। সালাম না করেই সে পালাল। এই তো সেদিনের ঘটনা। একেবারে সত্য ঘটনা। এখনও বউট বেঁচে আছে। স্বামীট মারা গেছে। বাবার কৃপা না হলে সেদিন মরেই যেত সব।" মসিনা কাজী থামলেন। প্রত্যেক মাজারকে ঘিরেই এমন জনশ্রুতি প্রচলিত থাকে। সিয়ান গ্রামের মাখদুম বাবার মাজারে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম সেই জনশ্রুতি। পাশের মাঠ থেকে ছেলেদের ক্রিকেট খেলার হইচই ভেসে আসছিল।

বিগত আট বছর এই রাস্তায় বোলপুর – নানুর যাতায়াত করছি, কখনও এই মাজারের নাম শুনিনি। একদিন ফয়জুল্লাপুর-দাতিনার বুড়োরাজতলায় কবিগান শুনে রাতের বাসে বাড়ি ফিরছি, সিয়ানের এই মাজারের সন্ধান দিলেন এক সহযাত্রী। পাথরচাপুরির দাতাবাবার মাজার ঘুরে এসেছি শুনে বললেন, "দাতাবাবা তো সাম্প্রতিক কালের। 'দরবেশ মহবুব শাহ' পরিচিত 'দাতাবাবা' নামে। ১৮৯২ সালে ১০ই চৈত্র তিনি মারা যান। ১০ই চৈত্ থেকে তাই পাথরচাপুরিতে

মেলা বসে। তুলনায় সুপ্রাচীন এই সৈয়দ মাখদুম সাহেবের মাজারটি জনতার ভিড় এড়িয়ে বেঁচে আছে আজও। কত প্রাচীন কেউ জানে না। পারলে ঘুরে আসুন একদিন।” ভদ্রলোকের নাম-ধাম জানার আগেই তিনি হসপিটাল মোড়ে নেমে গেলেন। অতএব দেরী না করে ছাত্র সোহমকে বাস থেকেই ফোন করে জানালাম একদিন মাখদুম সাহেবের মাজার যেতে চাই। সোহম ওর বন্ধু সাহিলের সাহায্য চাইল। সাহিলের বাড়ি সিয়ান গ্রামেই। দুজনে বোলপুর কলেজের ইংরেজি অনার্সের ছাত্র। সাহিলের নির্দেশমত আমরা বাসে সিয়ান গ্রাম স্টপেজে নেমে ওকে ফোন করলাম।

ছবি ১

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজির গৌড় জয়ের পর বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রসার শুরু হয়। বখতিয়ার খিলজির আক্রমণ এড়িয়ে লক্ষণসেন অনুগামীদের নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেও দুর্ধর্ষ তুর্ক আক্রমণের সম্মুখীন হতে হল বাংলাকে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ‘কাফেরদের সংস্কৃতি’ তরবারির সামনে মাথা নামাল। হিন্দুদের মন্দির, বৌদ্ধদের মঠ আক্রান্ত হল। নালন্দা, ওদন্তপুরি, বিক্রমশীলা, সোমপূরী, জগদ্দল প্রভৃতি বৌদ্ধ মঠ ও বিহারগুলি লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হল। বৌদ্ধরা বাংলা ছেড়ে চলে গেল নেপালে ও অন্যান্য অঞ্চলে। মন্দির ভেঙে তার পাথর দিয়েই তৈরি হল মসজিদ। প্রায় দেড়শ বছর (১২০০-১৩৫০খ্রিঃ) ধরে খিলজী, তুঘলক ও বলবনী শাসক বংশের উত্থান পতনের কালেই বাংলায় ধর্মে একটা পালাবদল ঘটে গেল। বাংলায় পাকাপাকি জায়গা করে নিল ইসলাম ধর্ম। কিন্তু তুর্কী সুলতানরা তরবারির জোরে ধর্ম প্রচারের আগে বাবা আদম, সুলতান রুমি, সুফি সৈয়দ জালাল উদ্দিন তাবরিজি প্রমুখ ধর্ম প্রচারকরা বাংলায় এসেছিলেন। “মুসলমান বিজয়ের বহু পূর্বেই দেখা যায় মুসলমান সাধকের দল ভারতে আসিয়া সমাদর ও আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। জৈনদের পুরাতন প্রবন্ধে পাই অনুপমা দেবী নিজের ব্যয়ে ভারতের নানা স্থানে মুসলমান উপাসকদের জন্য আশিটি মসজিদ তৈয়ারি করাইয়া দেন।”[i] বাংলাতে ইসলামের প্রচারে পীর দরবেশদের ভুমিকাও

কম ছিলনা। “সূফী ফকির দরবেশ ও গাজীরা তখন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে নববিজিত ভূমিতে ইসলাম বিস্তারের চেষ্টা করতে লাগল। লুণ্ঠন ও ধ্বংস অপেক্ষা ধর্মপ্রচার ও আধ্যাত্মিক বিচারই হতে থাকে রাজ্য বিস্তারের প্রধান অঙ্গ।”[ii] মুসলমান শাসকরা এই পীর গাজীদের জমি দিতেন বসতি গড়তে। খানকা গড়ে দিতেন। তাঁরা বাংলার গ্রাম গঞ্জকে বেছে নেন ধর্ম প্রচারের জন্য। “যে সূফী পীরেরা বঙ্গদেশে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন ঘরানার। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে চিশতিয়া, কালান্দারিয়া, মাদারিয়া, কাদেরিয়া, সোহরাওয়ার্দি, আহমদিয়া এবং নাকশাবান্দিয়া সম্প্রদায়ের সূফীরা এ দেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।”[iii] সুফিদের মধ্যে সালিক (শরিয়তে বিশ্বাসী) এবং মজ্জুব (শরিয়তে বিশ্বাস প্রায় নেই) এই দুই শ্রেণী ছিল। মজ্জুব ফকিররাই বাংলায় সবচেয়ে বেশী প্রভাব ফেলে। বাংলার হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনার সবচেয়ে বড় নিদর্শন পীরপূজা। “পীর বলতে শাহ্, শেখ, মুরশিদ, ওস্তাদ, সূফী প্রমুখ সাধুসন্তদের বুঝাত। মুসলমান সেনাপতিগণও যুদ্ধে নিহত হলে গাজী-পীর রূপে পূজিত হতেন। .... পীরের দরগাসমূহের প্রতি হিন্দু মুসলমান উভয়েই সমানভাবে শ্রদ্ধা ও অর্ঘ্য নিবেদন করত।”[iv] ফারসি ‘দরগাহ’ শব্দের প্রতিশব্দ ‘মাজার’। আওলিয়া দরবেশদের সমাধিস্থল মাজারে পরিণত হয়। দরবেশদের জন্ম মৃত্যু তিথিতে মাজারে উৎসব পালিত হয়ে থাকে। কবরকে মসজিদ বানানো ইসলামে নিষিদ্ধ। তাই মাজারে নামাজের চল নেই। মাজার কেন্দ্রিক এই “পির প্রথার উৎপত্তি-স্থল ইরান-আফগানিস্থান। কিন্তু বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে এ প্রথার উর্বর ভূমি প্রস্তুত হয়েই ছিল তান্ত্রিক গুরুবাদ ও বৈষ্ণব গোঁসাইবাদ-এর মাধ্যমে।..... অতীতের দেব-দেবীদের কাছে যেমন নানা কারণে লোকেরা মানত করত, পূজা করত, বলিদান করত, সন্ধ্যাবাতি জ্বালাত পিরের দরগায়ও মানত করা, জীবিত বা বিদেহী আত্মার কাছে প্রার্থনা, সমাধিতে সন্ধ্যাবাতি দেওয়া, ধুপধোঁয়ার স্থলে আগরবাতি বা গন্ধবাতি জ্বালানোর রেওয়াজ হয়ে যায়।”[v]

ছবি ২

বোলপুর থেকে নানুর যাওয়ার পথে পাকুরতলা বা সিয়ান গ্রাম স্টপেজে নেমে ডানদিকে ১০ মিনিট হাঁটলেই পৌঁছে যাবেন সুফি সাধক মাখদুম বাবার মাজারে। মাখদুম বাবার একাধিক

মাজার আছে। বাংলাদেশের রাজশাহীতে, বিহারশরীফে মকদুম শরফুদ্দিনের মাজার আছে। সিউরির পাশে মহম্মদবাজার থানার সেকেড্ডায় মকদুম সাহেবের মাজার আছে। তাঁর নামেই ঐ এলাকার নাম মকদুম নগর। এঁরা সকলেই এক ব্যক্তি কিনা আমার জানা নেই। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, "মকদুম সাহেব --- শরীয়ৎপন্থী মানুষ ছিলেন না। তিনি মারেফৎ লাইনের দরবেশ ছিলেন।"[vi]

এই সিয়ান গ্রামের উল্লেখ আপনি পাবেন কৃত্তিবাসী রামায়ণে। প্রবাদ আছে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল এইখানে। সেই মুনির নামে একটি মন্দিরও আছে এখানে। আজ হিন্দু মুসলমানের মিলনভূমি সিয়ান। আমরা যখন বন্ধু সাহিলের সঙ্গে পথ হাঁটছি তখনই কানে আসছিল সংকীর্তন। গ্রামের মলিনতা চোখে বাজছিল। নিকাশি ব্যবস্থা ভালো না। বর্ষায় রাস্তা দিয়ে জল ছোটে। মাটির তৈরি বড় দোতলা বাড়ির পাশেই তৈরি হয়েছে পাকা দালান বাড়ি। কিন্তু যা খুঁজতে এসেছিলাম তা চোখে পড়তেই খুশিতে ভরে উঠল বুক। বিকেলের পড়ন্ত বেলায় গ্রামের পথে হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়ালাম এক নটকোনার দোকানের সামনে। সাহিল বলল, 'স্যার একটু ধূপ কিনে নিন।' ৬ টাকায় এক প্যাকেট ধূপ কিনে নিল সোহম। আমি আসলে দাঁড়িয়েছিলাম অন্য কারণে। হিন্দু মুসলমানের সমন্বয় সাধনা নিয়ে বই পড়েছি অনেক, কিন্তু এমন সুন্দর দৃশ্য বাস্তবেও দেখতে পাওয়া যায় জানতাম না। দোকানের মাটির দেওয়ালে গোলা সিঁদুরের রঙে লেখা "এলাহি ৭৮৬ ভরসা সন ১৪২২ সনের রবিবার শুভ লাভ" ।

ছবি ৩

গোঁড়া হিন্দু বা মুসলমান কেউ না মানলেও সহজ মানুষরা যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, আল্লাহ্য় বিশ্বাসী, দেবতার অনুগ্রহ পেতে ইচ্ছুক যারা, তারা মানে। 'আবজাদ' মান ব্যবহার করে ৭৮৬ এর অর্থ 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'। – অনেক প্রচারক বর্তমানে এসব লিখতে নিষেধ করছেন, বলছেন

‘পিথাগোরাসের নিয়মে ৭৮৬ মানে ‘হরে কৃষ্ণ’--অতএব ৭৮৬ লেখা বিধর্মী সুলভ।’ তারা মাজার সংস্কৃতির বিরুদ্ধেও কথা বলছেন। তারা বলছেন, ‘আরবীতে পীর শব্দ তো নাই'ই এমন কি 'পে' অক্ষরটি ও নাই। তাই আরবে পীর পাওয়া যায় না। কোন মুত্তাক্বী পীর হতে পারে না, কোন পীর মুত্তাক্বী হতেই পারে না। আলেম অর্থ জ্ঞানী। জ্ঞানী কখনো পীর হয়ে গদিতে বসবেন না।’ ইসলামি আকিদা সম্পর্কে যাদের সামান্যতম ধারণা নেই তারাই মাজারে যায়। পীর পূজা করে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে প্রার্থনা, রোগ জ্বালা থেকে মুক্তি কামনা, প্রতিবিধান চাওয়া, প্রদীপ বা মোমবাতি জ্বালানো, রজব মাসে খাজা বাবার নামে টাকা তোলা, ওরশে যোগ দেওয়া এবং আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে, ক্ষমা ও সাহায্য পাওয়ার জন্য কোন জীবিত বা মৃত পীর, ওলী বা বুযুর্গ ব্যক্তিকে অসীলা বা মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা ইত্যাদি আসলে শিরক। এই যুক্তি দেখিয়েই পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশে) অনেক মাজার সাম্প্রতিক কালে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। গত এক দশকে অনেক পীর ও মুরিদ খুন হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের এই দোকানে দেখছি সেইসব ফতোয়া অগ্রাহ্য করা হয়েছে; শুধু তাই নয়, যুক্ত করা হয়েছে হিন্দুর ‘শুভ লাভ’ কথাটিও। হিজরি সন না লিখে লেখা হয়েছে বঙ্গাব্দ। মাজারের নবনির্মিত প্রবেশদ্বারেও আরবিতে ৭৮৬ লেখা।

ছবি ৪

একটু এগিয়ে বাঁদিকে বাঁশতলায় আর এক লোকদেবতাকে পেরিয়ে ডানদিকে মসজিদ। মসজিদ পেরিয়ে দূর থেকেই চোখে পড়ল মাজারটি। উচু টিলার মত এলাকা। গাছপালায় ঘেরা। বাইরের কলে হাত পা ধুয়ে ভিতরে যেতে হয়। সেদিন তখনও সাহিল স্নান করেনি, তাই ও আমাদের সঙ্গে ভিতরে গেল না। জানাল, ‘গেটের সামনে একটা পাথর আছে, দেখে ডিঙিয়ে ঢুকবেন।’’ কাছে থেকে মাজারটিকে দেখে চোখ জুড়াল। বাংলার প্রাচীন বাঁকানো চালের রীতির ছাপ রয়েছে এই স্থাপত্যকীর্তিতে। সাদা রঙের উপর সবুজ ও লাল রঙ ব্যবহার করেছেন স্থানীয়

শিল্পী। ইটের তৈরি প্রাচীন গঠনটি অটুট, কিন্তু বাইরের 'সূচক শিলা' দুটিকে বাজে ভাবে রঙ করে অর্ধেক ঢেকে ফেলেছে ওরা। ডানদিকের ফলকটি আড়াআড়ি ভাবে ভাঙা। ভিতরের দিক থেকে ফলক দুটি দেখলে আকার সম্পর্কে ধারণা হবে। প্রবেশ দ্বারের পাশে অসংখ্য মাটির ঘোড়া। সাধারণে মানত করে গেছে। গুম্বুজ থেকে দূরে কার্নিশে বুরুজের ধারে বেরিয়ে থাকা কড়ি কাঠে হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শনও চোখে পড়ল।

ছবি ৫

গ্রামের মহিলা মসিনা কাজী দীর্ঘ চল্লিশ বছর মাজারটির দেখাশোনা করেন। সংসারের কাজ সামলে সকালে বিকেলে আসেন। সন্ধ্যেয় বাড়ি চলে যান। উনি জানালেন "বাবার বয়স যে কত কেউ তা জানে না। অই যে গেটে ঢুকতে দুদিকে দুটো পাথর দেখলেন অর কি ভাষা কেউ বলতে পারল না আজও। বিশ্বভারতী থেকে লোকজন এসেছিল, দিল্লি থেকে এসেছিল, কত ছবি তুলে নিয়ে যায় আপ্‌নাগ মত, কেউ বলে তো গেল না কি লেখা আছে। তা ছয় সাতশ বছর তো হবেই। গ্রামের মুরুব্বিরা আছে দেখাশোনা করে। ফাল্গুন মাসে মেলা বসে। সবাই আসে। বাঙালিরা আসে, মুসলমান লোকেরা আসে। বেস্পতিবার একটু ভিড় বেশি হয়।" বীরভূমের গ্রামে গ্রামে এই 'বাঙালি (হিন্দু ধর্মাবলম্বী বোঝাতে) ও মুসলমান (ইসলাম ধর্মাবলম্বী বোঝাতে)' শুনে শুনে এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

ছবি ৬

বাংলার বেশীর ভাগ মসজিদে, মাজারে ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি অর্থাৎ হস্তলিপি শিল্প 'নাসখ', 'সুলুস' এবং 'তুগ্রা' পদ্ধতিতে আরবী লেখা থাকে। এখানে দুটি ফলকই 'নাসখ' পদ্ধতিতে লেখা।

‘সিয়ান শিলালিপি’ (Siyan Inscription- 1221) নামে ইতিহাসে চিহ্নিত এই শিলালিপি দুটি আসলে বাংলার ইসলামি শাসনপর্বের প্রথম শিলালিপি (মতান্তরে দ্বিতীয়)। ফলকের একদিকে আছে সংস্কৃতে লেখা, অন্যদিকে আরবিতে। ডঃ ডি সি সরকারের মতে, সংস্কৃতে ছন্দবন্ধে লেখা আছে বাংলার পাল যুগের রাজা নয়পালের (১০৩৫-১০৫০; ‘পাল বংশের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা ’মহারাজা প্রথম মহিপালের পুত্র) অধিনস্ত কোন মহাসামন্ত বা সামন্তর নামে প্রশস্তি, যিনি রাজা নয়পালের হয়ে চেদিদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে আরকিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কোলকাতা অফিস থেকে প্রথম বিষয়টি দিল্লিতে পাঠান হয়। ১৯৭৫ সালে ঐতিহাসিক ডঃ জিয়াউদ্দিন এ. দেশাই প্রথম এই ফলকের লিপির পাঠ গোচরে আনেন। এপিগ্রাফিকা ইন্ডিকায় প্রকাশিত সেই প্রবন্ধে শিলালিপির বিস্তারিত অর্থ প্রকাশিত হয়।[vii] ডঃ দেশাই অনুমান করেছেন এই ফলক দুটি কোন হিন্দু মন্দিরের অংশ। কিন্তু কোথায় সে মন্দিরের অবস্থান ছিল তার কিছুই জানা যাচ্ছে না শিলালিপি দেখে। আরবি পাঠ থেকে জানা যাচ্ছে, ৬১৮ হিজরিতে (২৯ জুলাই, ১২২১ খ্রিস্টাব্দ) এই খানকা স্থাপিত হয় । সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজির (১২১২-১২২৭ খ্রিস্টাব্দ) আমলে তাঁর পুত্র আলি শের সিয়ানে প্রথমে একটি জলাধার তৈরি করেন এবং পরে তৈরি করেন এই খানকা। [viii]খানকা হল সুফি দরবেশদের আস্তানা। আধ্যাত্মিক চর্চা, আশ্রয়, আহার, চিকিৎসা, শিক্ষা সবকিছুর ব্যবস্থা থাকত এই একটা পরিসরে। সুদূর পারস্য থেকে খানকার ধারণা বাংলায় নিয়ে আসেন সুফি সাধকরা। তবে মখদুম বাবা সম্পর্কে কোন তথ্য ফলকে পাওয়া যায়নি। ফলক দুটি অংশত ভাঙা থাকায় সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধার সম্ভব হয়নি। বর্তমানে প্রবেশ পথের বামদিকের ফলকে আছে আল্লাহ্‌র গুণগান। ডানদিকের ফলকে দ্বিতীয় লাইনে ‘খানকা’ হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে এই স্থাপত্যকে। দুটি ফলকের

বিপরীত দিকেই উল্লিখিত সংস্কৃত শ্লোক খোদিত আছে।

ছবি ৭ ও ৮

মাজারের প্রবেশ পথের গ্রিলের গেটে লেখা আছে 'পিরবাবা সৈয়দ মাখদুম সাহেব'। আমরা ভিতরে ঢুকলাম। ভিতরে ঢুকে চাদর চড়ানো মাজারের রূপ দেখে আবারও চমকিত হলাম। ঘাড় উঁচিয়ে দেখলাম কিভাবে টেরাকোটা ইটের স্টাইল্যাকটিভ পেন্ডেনটিভ মোটিফ ধরে রেখেছে ডোম'কে। সোহম ধূপ জ্বালাল। বেশ কিছুক্ষণ পর মসিনা কাজিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'গেটের সামনে ঐ পাথরটি কেন ডিঙিয়ে ঢুকতে হয়?' কথা বলতে বলতে বাইরে চলে এলাম। "তখন তো মানুষের খমতা ছিল। বাবাকে সালাম করতে আসত বাঘেরা। এই সব অঞ্চলে তখন বাঘ থাকত। কোন কেউ অপ্‌রাধ করেছে বা হয়ত বাবাকে স্বীকার করতে চায়নি তো তাকে হয়তো পাথর করে ফেলে রেখেছে।" প্রতিটি মাজারকে কেন্দ্র করেই এই বাঘের গল্প থাকে। পীর আউলিয়াদের অনেকেই নাকি বাঘের পিঠে চেপে দ্বীনের (ধর্মের) প্রচার করেছেন। প্রবাদ আছে বাগদাদে আব্বাসীয় রাজত্বকালের শেষ দিকে সৈয়দ আলী আকবার সাহেব ও সৈয়দ আলী আসগর সাহেব - এই দুই ভাই বাগদাদ থেকে বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে বাংলাদেশে আসেন ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে। সত্যপীরের পটের গানে, গাজীর পটের গানে বাঘের ছবি সুলভ। পটের কেন্দ্রীয় প্যানেলে থাকে বাঘের পিঠে উপবিষ্ট গাজী এবং তার দুপাশে থাকে মানিক পীর, কালু পীর। ভাবধারার গানের আসরে খইবুর ফকিরের কাছে একবার জানতে চেয়েছিলুম বিষয়টা। তিনি বড় পীর আবদুল কাদের জীলানীর জন্ম বৃত্তান্তের 'জনশ্রুতি' শুনিয়েছিলেন।

ছবি ৯

“আওলিয়া মনসুর হাল্লাজ আল্লাহর সঙ্গে ফানা অবস্থায় বলেছিলেন ‘আয়নালহক’, মানে ‘আমিই খোদা’। সেই শুনে মোল্লারা ক্ষেপে গিয়ে বলল, আরে এত বড় কথা, নিজেকে আল্লা বলছে। ওকে কেটে ফেল। তারা তাঁকে হাত পা কেটে শূলে চড়িয়ে বধ করে এবং তাঁর মৃতদেহ কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলে। তখন প্রতিটি মাংসখণ্ড হতে ‘আয়নালহক’ আর ‘আয়নালহক’ রব উত্থিত হয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে। তখন বলল পুড়িয়ে ফেল। দেহখণ্ড পুড়িয়ে দিলে ছাইভস্ম থেকে রব উঠল ‘আয়নালহক’ ‘আয়নালহক’। বলল, নদীতে ফেলে দিয়ে এস। ছাইগুলো ফুল হয়ে ভাসতে ভাসতে চলল। যে কাজী সাহেব বিচার করেছিল, সেই কাজী সাহেবের মেয়ে তখন সহচরীদের নিয়ে নদীতে স্নানে গিয়েছিল। ঐ যে ‘আয়নাল হক’ ফুল হয়ে ভেসে চলেছে, সেই ফুল দেখে কাজী সাহেবের মেয়ে সহচরীদের বলল, ঐ ফুল আমায় এনে দাও। ফুলটা এনেছে। শুঁকেছে। গর্ভ হয়ে গেছে। কাজী সাহেবের মেয়ে অবিবাহিত। ঐ যে বড় পীরের যে জন্ম এটাই কিন্তু ঘটনা। সন্তান জন্ম নিলে লোকলজ্জার ভয়ে কাজী সাহেব সেই সন্তানকে জঙ্গলে ফেলে আসে। ঐ সন্তান হলেন বড় পীর আবদুল কাদের জীলানী। বাঘের দুধ খেয়ে মানুষ হলেন তিনি। বাঘ রক্ষা করল তাঁকে। বাঘ বড় পীর সাহেবের অনুগত হয়ে গেলে ঐ বাঘ নিয়ে সে লোকালয়ে বেড়াতে শুরু করল। বাঘ নিয়ে খেলা করে। বিভিন্ন খেলা দেখায়। এই কেরামতি দেখিয়েই একদিন মিলন হয় মা ছেলের। ... শাস্ত্রে ‘আখেরি পয়গম্বর’ কলমটা যদি না লেখা থাকত তবে বড় পীর আবদুল কাদের জীলানী নবী হতেন।”[ix] হযরত আবদুল কাদের জীলানী রহমাতুল্লাহি আলায়হির সরাসরি খলিফা হলেন হযরত বাবা আদম শহীদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি, যিনি বড় পীরসাহেবের জীবদ্দশায় এবং তাঁরই নির্দেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন এবং বাংলাদেশেই শাহাদত বরণ করেন। তিনিই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম খানকায়েকাদেরিয়া প্রতিষ্ঠা

করেন।

ছবি ১০

এই সময় এক ভক্ত এলে মসিনা কাজী এগিয়ে গেলেন। সোহম দেখাল, "স্যার দেখুন এগুলো নিশ্চয় কিছু বটে।' দেখলাম, মাজারের বাইরের দালানে সাদা গোল গোল দাগ। সেই দাগগুলোর কিছু টাটকা, কিছু মুছে গেছে। বেশ কিছু ছবি তুললাম এইবার।

ভক্তটির পূজা শেষ হয়েছিল। তাকে পিছন হেঁটে একেবারে বাইরের রাস্তা পর্যন্ত বের হতে দেখে আমরা অবাক। মসিনা কাজী আমাদের সাহায্য করলেন বিষয়টি বুঝতে। "বাবাকে সম্মান জানিয়ে এইটা করে সবাই। সবাই মেনে আসছে।" 'আর ঐ দাগগুলো?' সোহমের জিজ্ঞাসা। "বাবার কাছে মানত করে চুন দিয়ে গেছে বাবাকে। ধর কার কোন অপরাধ করেছে কেউ, ন্যায়বিচার পায়নি সমাজে, তাকে শাস্তি দিতে চায়, তার গায়েও চুন ফোটাতে চায়; এইমত মনের কামনা পূর্ণ করতে চায় তারা চুন দিয়ে যায়। কামনা মিটলে সিন্নি দেয় বাবারে। আসলে বাবার কাছে সব কিছু চাওয়া যায়।" সাহিল জানাল, এই মাজার থেকে শুরু হয়ে প্রায় সাতশ আটশ মিটার দূরে বর্তমান ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মন্দির পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ আছে। সুড়ঙ্গের মুখ দেখে আজ বোঝার উপায় নেই হয়ত কিন্তু এলাকার মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম শুনে আসছেন সুড়ঙ্গ সম্পর্কে। কেমন করে এক ইংরেজ সাহেব পীর বাবাকে অশ্রদ্ধা করে বিপদে পড়ে মারা যান মসিনা কাজী সেই গল্পও সংক্ষেপে শোনালেন।

ছবি ১১

বাড়ি ফেরার সময় সাহিলের বাড়িতে গেলাম। ওরা দুই ভাই। দাদা সোহেল। নতুন

আইসক্রিম তৈরির কারখানা খুলেছে দুই ভাইয়ে। পাথরচাপুড়ির ‘দাতা বাবা’র নামে ওদের প্রোডাক্টের নাম রেখেছে ‘দাতা আইসক্রিম’। ফ্যাক্টরি ঘুরে দেখতে দেখতেই সোহম আইসক্রিম টেস্ট করল। আমি পেলাম ডিম ভাজা আর চা। সন্ধ্যেবেলা চপ সিঙ্গারা মুড়ি মিষ্টি দিয়ে আর একপ্রস্থ জলযোগ মিটিয়ে বেরচ্ছি, সাহিলের মা এক ব্যাগ পেয়ারা ধরিয়ে দিল সোহমের হাতে। কোন এক বৃহস্পতিবার আর একবার আসব। জানালাম সাহিলকে। সাহিল বলল, “চলুন স্যার, আমি বোলপুর পড়তে যাব। এখনি বাস আছে। বাকি রাস্তাটা একসঙ্গে ফেরা হবে।”

ছবি ১২

কৃতজ্ঞতা - সুভাষ ভৌমিক, সাবির আলি ,মহম্মদ হাফিজুর ,অর্ণব ঘোষাল

---

[i] ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা, ক্ষিতিমোহন সেন, বিশ্বভারতী, ১৪০৭, কলকাতা, পৃ.১১

[ii]বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা- প্রথম খণ্ড, গোপাল হালদার, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং, ১৩৮০, কলিকাতা, পৃ.৩৮

[iii]হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, গোলাম মুরশিদ, অবসর, ২০০৬, ঢাকা, পৃ.৬৭

[iv]বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, ড° অতুল সুর, সাহিত্যলোক, ২০১২, কলকাতা, পৃ.২২৭

[v]বাংলাদেশ ও ইসলামঃ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আলোচনা, সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ. ১৮১-১৮২

[vi]বীরভূমি বীরভুম, সম্পাদনা – বরুণ রায়, প্রথম খণ্ড, প্রাচীন মসজিদ মাজার ও সুফি সাধক গণ- এ মান্নান, দীপ প্রকাশন, কলিকাতা, পৃ.২৩৬,২৪২

[vii]An early thirteenthcentury inscription from west Bengal, Z.A. Desai.EIAPS, 1975.New Delhi, P- 6-12

[viii]Monuments around Santiniketan, Edited by Pialee Mukherjee, Subhi Publications, 2010, Dealhi, P-72-73

[ix]Saturday, May 6, 2017 তারিখেভাবগানেরআসরেখইবুরফকিরেরবলালোকশ্রুতি।রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম